এশিয়া প্রতিবেদন ৩৩৫

কক্সবাজার/ঢাকা/ব্রাসেলস, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩

International Crisis Group www.crisisgroup.org

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংকট বাড়ছে

গবেষণার প্রধান ফলাফল

নতুন কী? বাংলাদেশের শরণার্থীশিবিরগুলোতে ২০১৭ সাল থেকে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার বসবাস। আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর লড়াই এবং ত্রাণসহায়তা কমে আসায় সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ঢাকা ও নেপিডো শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিরাজমান নিরাপত্তাহীনতা এবং নাগরিকত্ব ও অন্যান্য সুরক্ষার বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় বড় সংখ্যক শরণার্থীর প্রত্যাবাসনের বিষয়টি অবাস্তব।

কেন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ? প্রত্যাবাসনের জন্য চাপ প্রয়োগে ঢাকা শরণার্থীদের চলাফেরার স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশে কাজ করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ত্রাণসহায়তা সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড সংকুচিত করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজও জটিল করে তুলেছে। শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে শরণার্থীরা অপরাধী চক্রগুলোতে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসনের মতো মরিয়া পথে পা বাড়াচ্ছে।

কী করা উচিত? মানবিক সহায়তায় সাড়া দানের ক্ষেত্রে নিজেদের সমর্থন আরও বাড়ানোর মাধ্যমে বিদেশি সরকারগুলো শরণার্থীদের আশু স্বস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। একই সঙ্গে, দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে দাতাদের সহযোগিতায় ত্রাণসহায়তা দক্ষতা এবং শরণার্থীদের স্বনির্ভরতা বাড়াতে ঢাকার উচিত নিজেদের নীতি-কৌশলে সমন্বয় সাধন করা। শরণার্থীশিবিরগুলোতে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখা উচিত ঢাকার।

বেশিরভাগ রোহিঙ্গার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসার ছয় বছর পরও বাংলাদেশে থাকা প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর দেশে ফেরার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে মিয়ানমারে ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থান বড় আকারের প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনাকে আরও ক্ষীণ করেছে। গাদাগাদি করে থাকা শরণার্থীশিবিরগুলোতে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। শরণার্থীশিবিরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াইরত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধী চক্রগুলো থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক অগ্রাধিকার এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আন্তর্জাতিক ত্রাণসহায়তা কমছে। তদুপরি বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের আয়- রোজগারের ক্ষমতা সীমিত করে বিষয়টিকে আরও খারাপ করে তুলেছে। দাতাদের উচিত অবিলম্বে মানবিক সহায়তার পরিমাণ আগের পর্যায়ের কাছাকাছি বাড়ানো। আর নীতি পরিবর্তনে সরকারের সাথে কাজ করা যাতে আরও বেশি শরণার্থী নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। বৃহত্তর বেসামরিক রোহিঙ্গা নেতৃত্বের সুযোগ করে দিতে বাংলাদেশেরও উচিত শরণার্থীশিবিরে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনা।

গত বারো মাসে প্রতিদ্বন্দ্বী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্যের লড়াইয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণের কক্সবাজার জেলায় বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা শরণার্থীশিবিরগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। একসময়ের প্রভাবশালী আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) মতো গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লড়াইয়ে বেশকিছু সংখ্যক শরণার্থী নিহত হয়েছেন। মুক্তিপণের জন্য শরণার্থীদের অপহরণ করছে সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধী চক্রগুলো। অপহরণের ঘটনা ২০২৩ সালে প্রায় চারগুণ বেড়েছে। আগে যেখানে সহিংসতা শুধু রাতের বেলায় ঘটত, জঙ্গিরা এখন ছুরি এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি বন্দুক নিয়ে দিনের বেলায় শরণার্থীশিবিরে ঘুরে বেড়ায়; বাসিন্দাদের হুমকি দিচ্ছে আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করছে। বাংলাদেশের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ২০২০ সালের জুলাই থেকে শরণার্থীশিবিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। শুধু শরণার্থীদের সুরক্ষা দেওয়ার সরঞ্জামের অভাবই নয়, বরং এই বাহিনীর সদস্যরা সমস্যায় জড়িত বলে মনে হচ্ছে। এই বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, রোহিঙ্গাদের অপহরণ এবং এমনকি নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে, অথচ তাঁদের সহায়-সম্বল বলতে কিছু নেই।

এদিকে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে সাড়া দানে আন্তর্জাতিক সমর্থন কমছে। ২০২২ সালে জাতিসংঘের মানবিক আবেদনে মাত্র ৬৩ শতাংশ অর্থ পাওয়া গেছে। আর ২০২৩ সালের এখন পর্যন্ত অর্থসহায়তার প্রতিশ্রুতি আরও অনেক কমেছে। এর ফলে মানবিক সংস্থাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) দুইবার খাদ্য রেশনের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছে। প্রতি মাসে জনপ্রতি ১২ ডলার

PREVENTING WAR. SHAPING PEACE.

থেকে কমিয়ে ৮ ডলার করা হয়েছে যা একদিনে ২৭ সেন্ট করে পড়ে। এই কাটছাঁট বিপর্যয়কর; কারণ অধিকাংশ শরণার্থী ত্রাণসহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাওয়া ঠেকাতে সরকারের বিধিনিষেধের অর্থ হলো তাঁদের বৈধ কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক আগ্রাসনের পর খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, ত্রাণসহায়তা কমানোর ফলে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে দাম্পত্য সহিংসতা আরও বেড়ে যাওয়ার মতো ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে দুটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ২০২৩ সালের শুরুর দিকে নেপিডো এবং ঢাকা প্রত্যাবাসনের একটি পাইলট প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে এক হাজারের বেশি শরণার্থী ফিরতে পারে। মধ্যস্থতাকারী ভূমিকায় থাকা চীনের পাশাপাশি দুইপক্ষ (নেপিডো এবং ঢাকা) বিভিন্ন কারণে এ নিয়ে অগ্রগতি সাধনে আগ্রহী। মিয়ানমারের সামরিক সরকার বিশ্বাস করে, ২০১৭ সালের গণহত্যার অভিযোগের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে এ প্রত্যাবাসন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আশা করছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে এটি তাদের পক্ষে কাজে লাগবে। তবে প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। শরণার্থীরা তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে নেপিডোর দেওয়া আশ্বাসের বিষয়ে সন্দিহান আর তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে নাগরিকত্ব প্রদানে অস্বীকৃতির বিষয়ে সতর্ক। শরণার্থীদের সতর্ক হওয়ার উপযুক্ত কারণ রয়েছে। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে মিয়ানমারে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। নভেম্বরে রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনী এবং দেশটির অন্যতম শক্তিশালী জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির মধ্যে নতুন করে লড়াই শুরু হয় যা নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনকে কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে।

ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা, ত্রাণসহায়তা কমে যাওয়া এবং প্রত্যাবাসনে অচলাবস্থা- এই তিনটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিষয়গুলো এমন এক সংকট তৈরি করেছে যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বিধিনিষেধ শরণার্থীদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতাকে আরও গভীর করেছে এবং মানবিক সহায়তার ওপর চাপ বাড়িয়েছে। ঢাকার এমন নীতি বাস্তবতার সঙ্গে যায় না, যেখানে হাজার হাজার শরণার্থী ইতিমধ্যেই শরণার্থীশিবিরের আশপাশের শহরগুলোতে অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করছে। সেখানে তারা নিজেদের অবৈধ অবস্থানের কারণে নিয়মিত শোষণের শিকার এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

শরণার্থীশিবিরে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং অদূর ভবিষ্যতে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে সৃষ্ট হতাশা অনেক রোহিঙ্গাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অর্থের জন্য তরুণদের সশস্ত্র গোষ্ঠী বা অপরাধী চক্রগুলোতে যোগদান থেকে শুরু করে খাবার গ্রহণকারী সদস্যের সংখ্যা কমাতে পরিবারগুলোতে নিরুপায় হয়ে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের বাল্যবিয়ে দেওয়া। কয়েক হাজার হতাশ শরণার্থী মালয়েশিয়ায় যাওয়ার আশায় (সমুদ্রপথে) ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রাও করেছে। একই সময় অজ্ঞাত সংখ্যক শরণার্থী ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিরবে রাখাইন রাজ্যে ফিরে গেছে কিংবা সাধারণত শরণার্থীশিবির ছেড়ে যাওয়া নিষেধ এমন আইন থাকার পরও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে। দেশটির একটি টেকসই পদক্ষেপের সূচনা করা উচিত যা এ সংকট যে দীর্ঘায়িত ধরনের তা স্বীকার করে নেবে, এমনকি যখন দেশটি প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে অব্যাহতভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে এবং ত্রাণনির্ভরতা কমিয়ে দেয় এমন উদ্যোগগুলো এগিয়ে নিতে দাতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে তারা কেবল তখনই সেটা করতে পারে, যখন জরুরি ত্রাণসহায়তার বাইরের কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিয়ে ঢাকা তার নীতিগুলো পুনর্বিবেচনা করবে। অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে দাতাদের মানবিক অর্থসহায়তাকে এমন পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা উচিত যা শরণার্থীরা যাতে পর্যাপ্ত খেতে পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে তাদের মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে। ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় বাংলাদেশকেও শরণার্থীশিবিরগুলোতে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সংস্কার করতে হবে, শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বৃহত্তর বেসামরিক নেতৃত্বের সুযোগ করে দিতে হবে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য শরণার্থী সংকটকে কাজে লাগাচ্ছে এমন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কক্সবাজার/ঢাকা/ব্রাসেলস, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩